বাংলার ধান
ও ধান-সংস্কৃতি

সম্পাদনা

লীনা চাকী

পুনশ্চ

ভূমিকা

কৃষিযুগে এসে মানুষ স্থিত হল চাষবাসে। মাটি কর্ষণ করে ফসল ফলাতে হবে, তবেই খাদ্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে। তখন নিশ্চয় ধান চাষ ও ভাতকে প্রধান ও অবিকল্প খাদ্য হিসেবে নেওয়ার সিদ্ধান্ত সহজে ঘটেনি। স্বাদগ্রহণ, হাতড়ে বেড়ানো ঘটেছে হাজার হাজার বছর ধরে। একটা সময় মানুষ দেখেছেন ধানই ব্যাপকভাবে চাষ করা যায়। ভাতই একমাত্র খাদ্য যা দীর্ঘক্ষণ পেট ভরিয়ে রাখে, শরীরে বল জোগায় ও ক্ষতিকর নয়। ফলে ধান হল মানুষের কাছে প্রধান ফসল। ভাত হল খিদে মেটানোর আশ্রয়।

এই বাংলার মাটি ধান চাষের জন্য উর্বর। সিংহভাগ মানুষ ধানচাষের মধ্যেই জীবিকার সন্ধান করতেন, ধান-চাল বিক্রিই ছিল সংসারের আয়পয়। আপামর বাঙালির ভাত ছাড়া চলে না। মধ্যবিত্ত-ধনীর ভাতের পাশে নানা ব্যঞ্জন, নিরন্ন মানুষ এক থালা শুধু ভাত পেলেই হাতে স্বর্গ পান। ভাত যেহেতু খিদে মেটানোর জন্য প্রধান খাদ্য তাই ধান কৃষিজীবী মানুষের কাছে শস্যদেবী, ধান্যলক্ষ্মী। গ্রামের মানুষ প্রতিটি ভাতের কণার প্রতি শ্রদ্ধা রাখেন। মুসলিম পরিবারে বিছানো দস্তরখানার ওপর থালা থেকে একটি ভাত পড়লেও খুঁটে খেতে হয়। হিন্দু পরিবারেও 'পায়ের তলায় ভাত পড়লে কুষ্ঠ হবে' এমন নিষেধাজ্ঞা দিয়ে সাবধান করা হয়। এই রকম আরও নিয়ম গ্রাম বাংলার ঘরে ঘরে মেনে চলা হয়। আসলে যে শস্যটির জন্য আমরা বেঁচেবর্তে আছি তার প্রতি সম্মান জানানোই মূল কথা। যেহেতু ধান লক্ষ্মী, গৃহস্থের কল্যাণকারী তাই ধান নিয়ে প্রকৃতিবিজ্ঞানসম্মত প্রবাদ-প্রবচনের অন্ত নেই। এর পাশাপাশি চলত লোকায়ত জীবন থেকে উদ্ভুত ছড়া, গান, লোককথা, ব্রত, আলপনা ও ধান মরাইতে তোলার পর উৎসব। এসব বাংলার নিজস্ব সম্পদ। ঢেঁকি আর ধান ভানে না, লাঙলকে সরিয়ে ট্র্যাক্টরও জায়গা করে নিচ্ছে, শ্যালো মেশিন মাটির তলা থেকে জল উগরে দিচ্ছে—এইসব ছড়া, প্রবাদ, লোককথা, তারও বহু শতক আগের, এখনও ছড়িয়ে আছে গ্রামগুলির আনাচেকানাচে। বীজতলি থেকে মরাই পর্যন্ত যে বিস্তর লোকাচার সংস্কার, তা আমরা জানতে না পারলেও কৃষকের কাছে যাবতীয় আচার মান্য। বলতে চাইছি, যে ভাতের গ্রাস আমরা মুখে তুলি, তার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটি শুধুই খাদ্য হিসেবে। গ্রামবাংলার চাষিঘরে, গৃহস্থের বিশ্বাসে ধান-চাল-ভাত পরম শ্রদ্ধার।

প্রবল ধান চাষ ও লাভজনক দিকটি বেশ কিছুকাল আগে থেকেই চাষিদের অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রলুব্ধ করতে শুরু করল রাসায়নিক সার তাঁদের কাছে পৌঁছোনোর পর। অনেক পরে জানা গেল রাসায়নিক সার উচ্চফলনের জন্য ব্যবহার করার কারণে মানুষের শরীরে দূষণ-প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে, নষ্ট করছে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও কীটপতঙ্গের জগতকে।

বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া দেশি ধানকে আবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা শুরু হয়েছে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলির মাধ্যমে। আরও একটি কথা, ধান চাষ শুরুর পরে কোনো এক সময় থেকে ধানের বৈচিত্র, গড়ন, স্বাদ ইত্যাদি দেখে কৃষিজীবী মানুষরা আদরের নামকরণ করে বিভিন্নতা আনতে লাগলেন। সূক্ষ্ম সেই বিভাজন ধরেই হাজার হাজার লৌকিক নাম তৈরি হয়েছিল। দেশি ধানের অবলুপ্তির সঙ্গে সঙ্গে সেই নামগুলিও উধাও হয়ে গেছে। কিছু বৈচিত্রের কথা, কিছু নাম শোনানোর জন্য আছেন গ্রামের বৃদ্ধ চাষিরা। আর শোনান দেশি ধানের প্রতি এখনও তাঁদের মায়ার কথা।

এই বইটির মূল কথা, আগে যা কিছু বলা হল সেসবের ওপরে ভিত্তি করে নানা প্রবন্ধ, সাক্ষাৎকার, ধান-সংস্কৃতি, ইত্যাদির সংকলন ঘটিয়ে পাঠককে অবহিত করানো। যে ভাতের সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা নেই, তারই নেপথ্যের কথা তুলে ধরাই আমাদের উদ্দেশ্য। দেশি ধানকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা, বিদেশের ধান, চাষের সমস্যা, বিভিন্ন জেলায় বর্তমানে কেমন ধান চাষ হচ্ছে ইত্যাদি লেখার ঠিক পাশাপাশিই রেখেছি ধান-চাল নিয়ে গড়ে ওঠা সংস্কৃতি, আচার ও সাধ্যমতো সংগ্রহ করা ধাননাম। রাখা হল সরকারি ধান্য গবেষণা কেন্দ্রের উদ্ভিদবিদ বিজন অধিকারীর সাক্ষাৎকার। বর্তমান ধান চাষ, পারিবরিক অবস্থা ও আগামী প্রজন্মের মানসিকতা নিয়ে ছোটো-বড়ো ধানচাষিদের মূল্যবান মতামত। আর পুনঃপাঠের জন্য থাকল বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও মীরা চৌধুরীর লেখার কিছু অংশ।

২০১১-তে আমার সম্পাদনায় 'হৃদয়' পত্রিকার বিষয় ছিল 'ধান'। এই বইটি গড়ার সময় প্রকাশিত লেখাগুলির সঙ্গে জরুরি হিসেবে রেখেছি বেশ কিছু নতুন লেখা। তবুও বলব, এই সম্পাদনার কাজটি করতে গিয়ে দেখেছি ধান-চাল এমন একটি বিষয় যা নিয়ে জানার কোনো শেষ নেই। এই বইটি তারই খণ্ড-প্রকাশ। বইটি সাধারণ পাঠকের কৌতূহল কিছুটা মেটাতে পারলে আমরা তৃপ্ত হব। 'পুনশ্চ' প্রকাশনার কর্ণধার সন্দীপ নায়ককে বিষয়টি জানাতেই তিনি সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে দিলেন। তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ আমি। কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছেও যাঁরা লিখেছেন, সাক্ষাৎকার দিয়েছেন, গ্রামে ঘুরে ঘুরে লোকাচার, ধান নাম জানার মতো পরিশ্রমসাধ্য কাজ করেছেন।

জানুয়ারি ২০১৫ লীনা চাকী

সূচিপত্র

ব্রীহিয়ার ধান ও ব্রীহির বিদেশযাত্রা ১১
দিব্যজ্যোতি মজুমদার
দিশি ধানের খোঁজে ১৬
মিলন দত্ত
বিশ্বের ধান : কিছু তথ্য ২৫
কল্যাণ চক্রবর্তী
সুন্দরবনে ধান চাষের সমস্যা ২৯
জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ী
ধান চাষ কেমন হচ্ছে গ্রামবাংলায় ৩৫
জিতেন নন্দী
ধানের গোলা : শস্যাগার ৩৯
সুমহান বন্দ্যোপাধ্যায়
গ্রামবাংলার নবান্ন উৎসব ৪৯
দীপককুমার বড় পন্ডা
নতুন ধান্যে হবে নবান্ন ৬৩
পুলকেন্দু সিংহ
ধান দেব মেপে ৭২
গোপী দে সরকার
ঢেঁকি এখন স্বর্গের পথে ৭৬
ভাস্করব্রত পতি
কৃষকরমণী ৮৩
তুলিকা মজুমদার
ধান্যলক্ষ্মী ৮৮
শিবেন্দু মান্না
মধ্যযুগের বাংলা কাব্যে ধানের প্রসঙ্গ ৯৫
বরুণকুমার চক্রবর্তী
লোকজ্ঞানে সমৃদ্ধ ধান ১০৪
মনাঞ্জলি বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরবঙ্গের ধান ও লোকায়ত সংস্কৃতি ১০৭
দীপককুমার রায়
ধান : ব-দ্বীপের লোকজীবন ও সাহিত্যে ১১৫
সুরঞ্জন মিদ্দে
ধান নিয়ে রাঢ়ের নানা লোকাচার ১২৮
মুহম্মদ আইয়ুব হোসেন
রাঢ়ের লোকবৃত্তে ধান-পার্বণ ১৩৫
ভব রায়
নদিয়ার ধানচাষে বহমান লোকবিশ্বাস ১৪১
লোকেশ বিশ্বাস
ধানভানার গান ১৪৮
আর্য চৌধুরী
বাংলা প্রবাদ প্রবচনে ধান ১৫৮
সোমা মুখোপাধ্যায়
ধানকেন্দ্রিক উৎসবে আলপনা ১৭০
বিধান বিশ্বাস
বিনন্দ রাখালের পালা ১৭৫
শ্যামল বেরা
দুই বাংলার পিঠে-পার্বণ ১৮২
সায়ন্তনী চাকী

সাক্ষাৎকার :

উদ্ভিদবিদ বিজন অধিকারীর সাক্ষাৎকার ১৮৭
শুধু চাষ নিয়ে থাকলে সংসার চালানো মুশকিল ১৯৯
মিলমালিকরাই বাজার নিয়ন্ত্রণ করছেন ২০১
চাষ থেকে যে কিছু জমছে তা বুঝতে পারছি না ২০৫
চাষের সময় একটা আতঙ্কের মতো হয়ে উঠেছে ২০৮
জমি বাঁচাতে বিশ্রাম দেওয়া প্রয়োজন ২১০

পুনঃ পাঠ :

জমীদার ২১৫
চাষীর মেয়ে ২২১
দুই বাংলার ধাননাম ২২৮

ব্রীহিয়ার ধান ও ব্রীহির বিদেশযাত্রা

দিব্যজ্যোতি মজুমদার

ধান। ব্রীহি। পৃথিবীর সমগ্র খাদ্যশস্য উৎপাদনের এক-চতুর্থাংশ হল ধান। কোটি কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য। এই ধানের জয়যাত্রার ইতিহাসও বড়ো বৈচিত্র্যময়। দক্ষিণ-পূর্ব অংশের এশিয়া থেকেই ধান চাষের প্রচলন ক্রমে ক্রমে পশ্চিমদিকে প্রচলিত হতে থাকে। মধ্যযুগে এশিয়ার ধান পৌঁছোয় দক্ষিণ ইউরোপে। আক্রমণকারী সারাসেন গোষ্ঠী এশিয়া থেকে ধান নিয়ে গিয়ে প্রথম চাষ করতে শুরু করে। মধ্যযুগের অনেক আগে থেকেই ভারতীয় ধানের সমুদ্রযাত্রা শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু প্রশ্ন হল, ধানের আদি ইতিবৃত্ত জানা যায় কবে থেকে?

কৃষিবিজ্ঞানীরা একসময় বলতেন, ধানের প্রথম উল্লেখ রয়েছে খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০ অব্দে। একজন চিনা সম্রাট এই সালে প্রথম ঘোষণা করেছিলেন, ধান বোনার সময় একটি উৎসব পালন করা হবে। তাঁর ঘোষণার সাল সেটি হতে পারে, কিন্তু ধান চাষের প্রচলন আগে থেকে না থাকলে উৎসব পালনের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না। তবে নাম হিসেবে হয়তো উৎসব পালনের এই সময় সঠিক।

গবেষণা তো থেমে থাকে না। পরবর্তীকালের গবেষকবৃন্দ অন্য তথ্য দিলেন। সেই তথ্য প্রাচীন ভারতবর্ষকে ঘিরে। তাঁরা বললেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দে ভারতবর্ষে প্রথম ধানের ফলনের তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। সকলেই একমত হয়েছেন যে, এশিয়ার ভারতবর্ষ ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়াতেই প্রথম ধান চাষ হয়। কিছু লিখিত নাম পাওয়া যাচ্ছে শুধু ভারতবর্ষ ও চিনে। ভারতের তথ্য প্রাচীনতর। অন্য দেশে সেই সময় ধান উৎপাদন হলেও কোনো লিখিত তথ্য নেই। সব দেশের লিখিত ঐতিহ্য তত পুরোনো নয়। তাই ভারতবর্ষই প্রথম ধান উৎপাদনের দাবিদার হতে পেরেছে।

ভারতবর্ষের ধান কীভাবে সমুদ্রপাড়ি দিল তার এক বিচিত্র রোমাঞ্চকর ইতিহাস যেন রূপকথার মতো। কিন্তু পরিশ্রমী গবেষক সেই অন্যান্য বিপদসংকুল সমুদ্রযাত্রার তথ্য উদ্‌ঘাটন করেছেন। একই সঙ্গে ভারতীয় ধান ও একটি প্রাচীন শব্দের বিজয়যাত্রার কথাও শুনিয়েছেন।

সমুদ্রযাত্রার কাহিনির প্রথমে একটি শব্দ আলোচনা করা জরুরি। ব্রীহি। অর্থ হল ধান। শুক্ল-যজুর্বেদ, অথর্ববেদ ও পাণিনির লিখিত ঐতিহ্যে এই ব্রীহি শব্দ রয়েছে। আর ধান-সম্পর্কিত কারণেই প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ছিল ব্রীহিয়া।

এই সূত্র ধরেই ব্রীহির সমুদ্রযাত্রার কাহিনি গড়ে উঠেছে। ভারতীয় ঐতিহ্যের গৌরব যেমন প্রকাশিত হয়েছে, তেমনি মানবজাতির মাইগ্রেশনের সুপ্রাচীন তথ্যও রয়েছে। মানুষের মতো এমন যাযাবর প্রাণী পৃথিবীতে আর নেই। আজকের মাওরি আদিবাসীরা বাস করেন নিউজিল্যান্ডে। কিন্তু সেই ভূখণ্ডেও তাঁরা মূলত পরদেশি। দক্ষিণ ভারতের সঙ্গে তাঁদের সংস্কৃতির বন্ধন রয়েছে। আজ মাওরি আদিবাসী পলিনেশীয় জনগোষ্ঠী। তাঁরা নিউজিল্যান্ডের মোট জনসংখ্যার আট শতাংশ। ইউরোপীয় উপনিবেশকারীরা তাঁদের দেশ দখল করে কোণঠাসা করে দূর-দূরান্তে ঠেলে দিয়েছে। কিন্তু উন্নত সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারের জোরে আজও মাওরি আদিবাসী তাঁদের অস্তিত্ব গৌরবের সঙ্গে বহন করে চলেছেন।

দক্ষিণ ভারতবর্ষ থেকে সমুদ্রযাত্রার সেই ঐতিহাসিক 'রূপকথা'র অনুপুঙ্খ তথ্য দিয়েছেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানী ও ভাষাতাত্ত্বিকেরা। সেই 'রূপকথা'র কাহিনি বড়ো বিচিত্র।...

নীল সাগরের তীরভূমি, ঢেউ-এর পর ঢেউ ভেঙে এগিয়ে চলেছে কয়েকটি নৌকো। নৌকোয় অনেক মাছ, সোনালি রোদে তাদের রুপোলি আভা। তীরভূমিতে দাঁড়িয়ে তাদের উচ্ছল বউ-মেয়ে-মায়েরা। গান গাইছে—আনন্দের গান। বাবা ভাই অনেক মাছ নিয়ে ফিরেছে। আরও আনন্দ—উত্তল সাগর থেকে প্রিয়জন ফিরে এসেছে।

হো কোয়া কাই! হে কোয়া কাই!
হে পাপা তেরেতেরে! হে পাপা তেরেতেরে
এই ... ই ... ই ... এই ...

এই গান গায় মাওরি মেয়েরা। খুশির গান। ভুলে-যাওয়া সেই কোনো সুদূরকাল থেকে তারা থাকে নিউজিল্যান্ডে। সে দেশে তারা দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক, মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন। তারা আজ আদিবাসী জনগোষ্ঠী হিসেবে চিহ্নিত। এমন দিন আগে ছিল না। বড়ো করুণ আর দুঃসহ আজকের জীবন। নয়া উপনিবেশ তো সেদিনের কথা। কিন্তু মৌখিক ঐতিহ্যে বিধৃত রয়েছে পুরোনো দিনের স্মরণীয় গাথা। কেমন ছিল সেই সংস্কৃতি?

নিউজিল্যান্ডের উত্তর দ্বীপের সাগরতীরে মাওরি আদিবাসীদের এক গোষ্ঠী বাস করেন। তাঁরা হলেন তাকিতুমু আদিবাসী গোষ্ঠী। এঁরাই সবচেয়ে অকৃত্রিমভাবে প্রাচীন ঐতিহ্যকে বহন করে চলেছেন। মাওরিদের প্রাচীনতম ঐতিহ্যের কথা জানতে হলে এই গোষ্ঠীর কাছ থেকেই তা জানতে হবে।

পলিনেশিয়া থেকে মৌখিক ঐতিহ্যের নানা উপকরণ সংগ্রহ করেছেন সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা। এইসব অসংখ্য দ্বীপের তথ্য বিশ্লেষণ করে দু'টি অসাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছোনো সম্ভব হয়েছে। এক, এই জনগোষ্ঠীর জীবন কেটেছে দীর্ঘ লড়াই, সমুদ্রযাত্রা ও নতুন বসতি গড়ার মধ্যে দিয়ে। লড়াই বেধেছে দ্বীপে দ্বীপে, এক দ্বীপের মানুষ পরাভূত হয়ে কিংবা খাদ্যের অন্বেষণে দ্বীপ ছেড়ে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে, সমুদ্রই একমাত্র পথ, পথের শেষ হয়েছে নতুন দ্বীপে, নতুন উপনিবেশে। আজ তারা যেখানে রয়েছে, সেখানেও তারা পরবাসী ছিল। দুই,নিউজিল্যান্ডের মাওরি আদিবাসীরাও পরবাসী, নতুন বসতি একদিন মাতৃভূমি হয়ে উঠল।

তাকিতুমু মৌখিক ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে আমরা জানতে পারি, এই মাওরিদের আদি বাসভূমি ছিল সুদূর পশ্চিমদিকে। এই জন্মভূমির নাম ছিল উরু। যুদ্ধ শুরু হল, গোষ্ঠীবিরোধ চরমে উঠল, তখন পুহি-রাম্‌গিরান্‌গি নামে একজন গোষ্ঠীপতির নেতৃত্বে তাঁরা পুবদিকে এগিয়ে চলল। অবশ্যই সমুদ্রপথে। অনেক লম্বা লম্বা নৌকোয় চলেছে অসংখ্য অভিযাত্রীর দল, এক উষ্ণতর আবহাওয়ার দিকে। মন মানছে না নতুন দ্বীপে। বড়ো গরম। অসহ্য। সেই চঞ্চল সময়ে একজন সমুদ্র-অভিযাত্রী তু-তে-রান্‌গিআওয়া তাদের এক স্বপ্নরাজ্যের কথা জানাল। সে দেখে এসেছে সাগরতীরের সেই সবুজ রাজ্য। আরও পুবে পাড়ি দিতে হবে। তু-তে-রান্‌গিআওয়া বলল, সেই সবুজ রাজ্যের নাম ইরিহিয়া। অফুরন্ত খাদ্য সেখানে। উর্বর জমি। নানা সোনালি ফসল। ফলমূল। সমুদ্রের মাছ। সেই রাজ্যের মানুষজন রোগা, গায়ের রং কালো, ভদ্র ও শান্ত স্বভাবের।

সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা সামাজিক ইতিহাসের সূত্র খুঁজে পেয়েছেন এই মিথকথার মধ্যে। তাঁরা স্বদেশভূমি ছেড়েছিল যুদ্ধের কারণে, অশান্তিতে ও খাদ্যাভাবে। বসতি গড়ল যেখানে সেখানে খাদ্যের অভাব নেই, রয়েছে শান্তি। যারা এখানে আগে থেকেই রয়েছে, তারা শান্ত স্বভাবের। বিরোধ বাধবে না। পরম শান্তি।

তারা এল ইরিহিয়া এলাকায়। এখানেও গরম তবে তেমন অসহনীয় নয়। সবই সয়ে যায় ধীরে ধীরে, যদি যথেষ্ট খাদ্যের জোগান থাকে। গরম এলাকা বলে তারা ইরিহিয়াকে ইরিনান্‌গি-ও বলত,—সূর্যের তেজ প্রবল বলেই এই নাম। এখানকার আদি বাসিন্দাদের সঙ্গেই এরা থাকতে লাগল। আদি বাসিন্দারা ছিল যাযাবর। দুই জনগোষ্ঠী মিলে গেল। সবাই ক্রমে থিতু হল। মিশ্রণের ফলে, বিবাহ-সম্পর্ক গড়ে ওঠার ফলে চেহারায় তার প্রভাব পড়ল। এ-ও ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত হয়েছে। কাহিনির মধ্যে রক্ত-মিশ্রণের স্মৃতি সুপ্ত রয়েছে। পৃথিবীর কোনো জনগোষ্ঠীতেই বোধহয় এক রক্ত নেই। যাযাবর মানুষের স্বাভাবিক পরিণতি।

দক্ষিণ ভারত উপকূল থেকে এই দূরের অভিযানের শেষ পর্বে পৌঁছে গেল

যেমন মানুষ, তাঁদের মধ্যে দীর্ঘদিন গবেষণা করে সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীরা ভাষাগত সাদৃশ্যের নিদর্শন পেয়ে বিহ্বল হয়ে গিয়েছেন। বহু বছরের সন্ধানের ফলে তাঁরা স্থির সিদ্ধান্তেও পৌঁছেছেন। এই ভাষাগত সাদৃশ্যের অনন্য দৃষ্টান্ত ধানকে কেন্দ্র করে। ধান এবং ধানের অন্য নামের সঙ্গে তার সম্পর্ক।

এই পরিশ্রমসাধ্য গবেষণা করেছিলেন ভাষাবিজ্ঞানী ও সাংস্কৃতিক নৃবিজ্ঞানীর দল। সবচেয়ে আদি গবেষক হলেন এস পারসি স্মিথ। উনি বিশ শতকের একেবারে গোড়ায় 'হাওআইকি' নামে গ্রন্থ লেখেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত চতুর্থ সংস্করণে আরও বিস্তৃত তথ্য দেন। ১৯২৪ সালে আরও তথ্য সংগ্রহ করে গ্রন্থ লেখেন এল্‌সডন বেস্ট। গ্রন্থের নাম 'মাওরি অ্যাজ হি ওয়াজ'। এর পরের বছরে অর্থাৎ ১৯২৫ সালে পি. এইচ বাক লেখেন 'কামিং অব দ্য মাওরি।' ১৯২৯ সালে পি এইচ বাক লেখেন 'কামিং অব দ্য মাওরি।' ১৯২৯ সাল আর ডব্লিউ ফার্থ লেখেন 'প্রিমিটিভ ইকনমিক্‌স অব দ্য নিউজিল্যান্ডমাওরি।' এই গ্রন্থে ভারতীয় ঐতিহ্যের সূত্র ধরে মাওরিদের ধান চাষের বিস্তৃত বিবরণ আছে। ১৯৪৭ সালে বিস্ময়কর গ্রন্থ লেখেন এইচ ডি বি ডানসে। বইয়ের নাম 'হাউ দ্য মাওরিস কেম টু আওটিয়েরাও।' ১৯৬৬ সালে এ ওয়েস্ট্রা ও জে রিচি লেখেন 'মাওরি।'

গবেষকদের দৃষ্টিভঙ্গি ও তথ্য বিশ্লেষণে যে তথ্য পারসি স্মিথ প্রমাণ করেছিলেন, সেই তথ্য সকলেই মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়েছেন, কারণ তাঁদের সকলের সংগৃহীত তথ্যও একই কথা বলছে। তথ্যটি হল ধানকে কেন্দ্র করে।

সেই ভাষাতাত্ত্বিক তথ্যের বিবরণ দিচ্ছি।

মাওরি আদিবাসী তাঁদের দেশের নাম বলছে ইরিহিয়া। সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ভারতবর্ষের নাম ব্রীহিয়া। মাওরি অভিযাত্রীদল কি ব্রীহিয়ার উচ্চারণ করত ইরিহিয়া বলে? মাওরিদের প্রধান খাদ্য চাল, তারা বলে আড়ি, ভারতের দক্ষিণাঞ্চলের দ্রাবিড়ভাষী মানুষেরা চালকে বলে আরি। প্রাচীন ভারতবর্ষে ধানকে বলা হত ব্রীহি, আর ব্রীহিক হল ধান্যবিশিষ্ট। ব্রীহিয়া বা ইরিহিয়া দেশের নাম কি ব্রীহি বা ব্রীহিক থেকে এসেছে? হ্যাঁ, তাই এসেছে। মাওরিবিশেষজ্ঞ সব পণ্ডিত অনেক কাল আগে থেকেই এ বিষয়ে নিশ্চিত।

এ থেকেই বোঝা যায়, ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতির সঙ্গে মাওরিদের পূর্ববন্ধন ছিল। সবচেয়ে প্রাজ্ঞ মাওরি বিশেষজ্ঞ এলস্‌ডন বেস্ট বলেছেন :

As to the name of India, it is of interest to remember that Vrihia was an ancient Sanskrit name for India, and that this name can be pronounced by the Maori as Irihia or Wirihia. The word Ari the name of a very important food-supply of India, is the Dravirian

word for rice, and it may be compared to Vari, Wari, Pari etc., all of which denote rice. An old Sanskrit name for rice was Vrihi, which may possible have been the origin of the name Vrihia. Again Mr. S. Percy Smith has shown in his work Hawaiki that Hawaiki-Varinga is mentioned in Rototongan tradition as a name for the homeland and here again this Vari rice word appears. The Maori as he was : Elsdon Best, R. E. Owen Govt. Printer, Wellington, 1924. Pages 18-19.

প্রাচীন ভারতবর্ষের উপকূলবর্তী মানুজেন যে অকূল দরিয়ার দক্ষ মাঝি ছিল তারও হাজার দৃষ্টান্ত আছে। তাই দক্ষিণ ভারতবর্ষের মানুষ একদিন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে সুদূর মাওরি-ভূমিতে পৌঁছে যাবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সেসব তথ্যই তো রয়েছে প্রাজ্ঞজনের গবেষণায়।

ভারতীয় মানুষের প্রাত্যহিক জীবনে ও অনন্য সংস্কৃতি-ধর্ম-আচার-পাল-পার্বণ-উৎসবে ধানের যে সর্বব্যাপী ভূমিকা রয়েছে, তারই সঙ্গে ব্রীহির এই সমুদ্রযাত্রার সুবাদে সুদূর এক দ্বীপেও ধান যে এমন প্রভাব ফেলেছে তাতে আমাদের কিছুটা গরিমা হতে পারে, সে কথা ভুলব কেমন করে!